বাদল সরকার : বহমান জীবনের স্মৃতি

অমিতাভ ভট্টাচার্য

কিছু কিছু মানুষ আছেন নানা অভিজ্ঞতায় তাঁদের জীবন একেবারে টইটম্বুর। ধরুন তাঁদের কেউ জীবনে একবারই সমুদ্রে জাহাজ চড়েছেন। সমুদ্র উত্তাল হয়ে সী-সিকনেস-এর কবলে পড়ার নিদারুণ কষ্ট তাঁকে পেতে হয়েছে। কিংবা তিনি হয়তো গেছেন আফ্রিকার কোনো দেশে চাকরি করতে। হঠাৎই সেখানে গৃহযুদ্ধের দাপট, একেবারে ধনে - প্রাণে মারা পড়বার অবস্থা। শেষে কোনোরকমে প্রায় এককাপড়ে দেশে ফিরে আসা। সেরকম মানুষের আত্মজীবনী তো রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো মুচমুচে হবেই। কিন্তু সেই তিনিই যদি হন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আর বাংলা তথা ভারতে থিয়েটারের নতুন ঘরানার স্রষ্টা — তবে তাঁর আত্মজীবনী হয়ে ওঠে একখণ্ড ইতিহাস — সুখপাঠ্য ইতিহাস। বাদল সরকারের আত্মজীবনী পুরনো কাসুন্দির কথা বলছি। চার খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়েছে ২০০৬-০৯ -তে। প্রথম তিন খণ্ড ছেপেছে লেখনী। চতুর্থ খণ্ডর প্রকাশক অঞ্জলি বসু।

প্রথম খণ্ডর 'মুখবন্ধ' - তে বাদলবাবু জানিয়েছেন : '' 'আত্মজীবনী' 'আত্মচরিত' এসব শব্দ বড়ো ওজনদার, ওরকম ভারি কিছু লেখার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই। ...জীবনের সহ অভিজ্ঞতা হাল্কা হয় না, তবু হাল্কা হাসিকেই প্রাধান্য দিয়েছি, চেষ্টা করে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে।" আর চতুথ খণ্ডয় তাঁর পরিষ্কার ঘোষণা: ''তৃতীয় থিয়েটারের আখ্যান লেখার দায় আমার নয়।"

পুরোনো কাসুন্দি আসলে এক বহমান জীবনের গল্প। জীবন তো বয়েই চলে, কিন্তু তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁচতে পারেন কজন ? আমাদের অধিকাংশর জীবনযাপন মানে তো চেনা ধাঁচায় স্থবির এবং আরও স্থবির হয়ে বেঁচে থাকা। বাদলবাবু কিন্তু এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর বন্ধু বারীন সাহার একটি 'আপ্তবাক্য' বাদলবাবুর জীবনের সঙ্গে শতকরা একশো ভাগ মেলে। সেটি হলো: ''আমরা শেষ পর্যন্ত যেটা ভালো লাগে সেটা করি" (৪:৫০)। পরিবার, পার্টি, চাকরি এমনকী তাঁর অতিপ্রিয় মঞ্চও তাঁর কাছ থেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ আদায় করতে পারে নি। মিছিল -এর সেই খোকার মতো তিনি পথ চলেছেন এক বাঁক থেকে পরের বাঁকে, এক মোড় থেকে আর - এক মোড়ে, চেনা পথ থেকে অচেনা নতুন পথে। সে পথ-চলা এখনও শেষ হয় নি।

পুরোনো কাসুন্দি একজন স্ব-শিক্ষিত মানুষের জীবন - কাহিনী। নাটক লেখা, অভিনয়, নির্দেশনা— বাদল সরকার কোথাও নাড়া বেঁধে এসবের তালিম নেন নি। মঞ্চের বাইরের নাটকের নানা ব্যাপার শিখেছেন বিদেশে বিভিন্ন দলের নাটক দেখে। তাদের রিহার্সালে থেকে আর ওয়ার্কশপ ও আলোচনা করে। তাঁর নাস্তিক হওয়ার বা কমিউনিস্ট পার্টির কাজে ছড়িয়ে যাওয়াও কারুর পাল্লায় পড়ে হয়নি। নাস্তিক হওয়ার ঘটনাটা বাদলবাবুর জবানীতেই শোনা যাক। স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হলেন, ''কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি মনের ভিতর তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিলো। ধর্মের ব্যাপারে গভীর বিশ্বাস ছিল বলেছি আগে, বাইবেল অখণ্ড সত্য বলে মানতাম, এখন ঈশ্বরের ছদিনে বিশ্বসৃষ্টি সপ্তম দিনে বিশ্রামের কাহিনী পদার্থবিজ্ঞান রসায়নশাস্ত্র গুলিয়ে দিচ্ছে। আদি মানব - মানবী অ্যাডামইভের গল্প ডারউইনের বিবর্তনবাদের সঙ্গে মিলছে না। যুক্তিবাদী মন বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারছে না। আবার এতোদিনের সঙ্গে মিলছে না। যুক্তিবাদী মন বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারছে না। আবার এতোদিনের গভীর বিশ্বাস টলতে থাকলেও সহজে ধসছে না।"

শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানই জিতেছিল, ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে নাস্তিক হয়েছিলাম।"

সমাজ বদলানোর তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী হয়েছিলেন লিওনটিয়েভের বই মার্কসীয় অর্থনীতি পড়ে। যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। স্ব-শিক্ষিত হতে হলে খাটুনিটা হয়তো বেশিই পড়ে, কিন্তু শিক্ষাটা হয় বেশ পাকাপোক্ত। তাই আশি পেরিয়েও বাদলবাবু এখনও নাস্তিক। কোনো পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও নতুন মানব সমাজ গড়ার আদর্শে তাঁর আস্থা আজও অবিচল।

বাদলবাবুর ছোটোবেলাটা কিন্তু নেহাতই সাদামাটা। উত্তর কলকাতার এক খ্রিস্টান পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান তিনি। বাবা মহেন্দ্রলাল স্কটিশ কলেজের অধ্যাপক (পরে অধ্যাক্ষ) এবং টমোরী হস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট। সেই সুবাদে সপরিবারের ঐ হস্টেলের দোতলায় বাস করতেন (পরে প্যারী রো - তে নিজেদের বাড়ি)। পড়াশুনোয় ভালো কিন্তু খেলাধুলো বা অন্য কিছুতে তেমন চৌখস ছোটোবেলায় ছিলেন না বাদলবাবু। তা নিয়ে খানিক হীনমন্যতাও ছিল তাঁর। একটু বড় হতেই একটি নেশা পেয়ে বসল— বই পড়ার নেশা। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই পড়া। বাড়িতে প্রচুর বই ছিল, তার সঙ্গে স্কুলের লাইব্রেরি, পাড়ার সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরি। বাংলা আর পরে ইংরেজি—প্রচুর গল্প - উপন্যাস- নাটক পড়া। ছোটোবেলা থেকেই নাটক পড়তেই বেশি ভালো লাগত তাঁর। নাটক তখন বাদলবাবু দেখেন নি তেমন। তবে রেডিও-য় নাটক শুনতেন খুব। ক্রিস্টাল রেডিওর হেডফোন কানে লাগিয়ে তিন ঘন্টা ধরে সরাসরি সম্প্রচার করা নাটক শোনায় ছিল ভীষণ উৎসাহ। বাদলবাবুর শৈশব- কৈশোরের স্মৃতিতে উজ্জল বাবা আর দাদামশাইয়ের কথা; দার্জিলিং, দেরাদুন, শিলং -এ বেড়াতে যাওয়ার গল্প। অজুদার সঙ্গে সম্ভবত জীবনের প্রথম অ্যাডভেঞ্চারের কথা। বাদলবাবুর জন্ম ১৯২৫-এ। ১৯৩০ আর ৪০ -এর দশকের গোড়া পর্যন্ত তাঁর শৈশব- কৈশোর। আগে জন্মানোর অ্যাডভানটেজ ! দু-দুবার বিশ্বভারতীর টাকা তোলার অনুষ্ঠান দেখেছেন মঞ্চে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। বাদলবাবুর স্মৃতিচারণে টুকরো - টুকরো করে ধরা আছে সেই সময়ের ছবি, তখনকার কলকাতার নানা কথা।

অতি - আধুনিক এল ই ডি টেলিভিশনের মতোই ছিপছিপে বাদলবাবুর ভাষা, আইসস্কেটারের মতোই মসৃণ তার গতি। অল্প কথায় অনেক কিছু বলার ক্ষমতা সে-ভাষার আছে। সে-ভাষায় তখনকার কলকাতার একটি ছোটো বর্ণনা শোনা যাক: ''কলেজ স্ট্রীট হয়ে দোতলা বাস যেতো, তার দোতলায় ছাত ছিল না, বৃষ্টি হলে ভিজতে হোতো। ...ভোররাতে আর বেলা

তিনটে নাগাদ হোসপাইপের জলে রাস্তা ধোয়া হোতো নিয়মিত, আবর্জনা প্রতিদিন সাফ হোতো, জমে থাকত না। লোডশেডিং আবর্জনা প্রতিদিন সাফ হোতো, জমে থাকত না। লোডশেডিং অজানা ছিল কলকাতাবাসীর, ট্রাম লাইনচ্যুত হতে পারে তার ভাবা যেতো না, গঙ্গাজল আমাদের চারতলার ছাতের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত এমনিই উঠতো, পাম্প করতো হোতো না।"

সে-সময় ব্ল্যাক মার্কেট হোর্ডিং, ব্ল্যাক আউট, কুইট ইন্ডিয়া সবকিছুই দেখেছেন। বোমার ভয়ে সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে তমলুকে বাস করতে হয়েছে কয়েক মাস। তবে বাদলবাবুর জীবনের মোড় ঘুরতে থাকে বোধহয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে হোস্টেলে থাকার সময় থেকেই।

বাদলবাবুর প্রথম নাটক লেখা ক্লাস সেভেনে। ইতিহাস বইতে পড়া পিণ্ডারী যুদ্ধ নিয়ে লেখা নাটক। দ্বিতীয়টি ক্লাস টেনে : স্লিপার্স অফ সিণ্ডারেলা। বাড়িতেই ভাইবোন - বন্ধুদের নিয়ে সে-নাটকের অভিনয়। তমলুকে থাকার সময় প্রথম বড় আসরে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয়ের করুণ অভিজ্ঞতা।

স্কুলে পড়তেই বিদেশী গল্প অবলম্বনে বাংলা গল্প লিখতে আরম্ভ করেন তিনি। সে অভ্যেস তাঁর এখনও বজায় আছে। ''গল্পের খোঁচায় গল্প'' নাম দিয়ে এরকম গল্পর তিন-তিনটে বই বাদলবাবু হালে লিখেছেন।

ইন্টারমিডিয়েটর শেষের দিকে এসে লেখার সূত্রে দিদির বন্ধু, সুকুমারী ভট্টাচার্যর কাছে যাতায়াত শুরু করেন। তারপর সুকুমারীদেবীর প্রভাবে সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে একটা গুছানো পথে। লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর অনেক মূল্যবান পরমর্শা বাদলবাবুকে বেশ সাহায্য করেছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অমিতাভ নামে একটি বইয়ের নাম শুনেছি। কিন্তু জোগাড় করতে পারি নি বলে পড়া হয় নি। পুরোনো কাসুন্দি-র একটা অধ্যায়কে ''ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাদল সরকার'' নাম দেওয়া যায়। যেমন দুরন্ত সব ঘটনা, তেমনি ফাটাফাটি সব বর্ণনা। সেখানকার ছাত্ররা কীরকমভাবে চলত তার একটু আঁচ দেওয়া যাক: ''স্টাডিং রুলস্। বেশ মোটা একখানা ছাপানো পুস্তক। দাদারা বলতেন— কী কী নিয়ম ভাঙতে হয়, তার লিস্টি আছে এই বইয়ে। তা দাদারা যেমনটি শিখিয়েছেন তেমনটাই শিখেছি।'' কী সব সব চরিত্র সেখানে, ব্রজেন ব্যানার্জী, নেপাল দত্ত, অজয়দা, অরুণদা, মায় নারায়ণ সান্যাল পর্যন্ত। যা ফর্মা না এক একজনের — চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে বাখার মতো। নানান ঘটনা— শীতের রাতে অক্কা দাসের বাগানের ফুলকপি চুরি, লায়েক হয়ে হয়ে গঙ্গায় সাঁতরাতে গিয়ে প্রায় 'লাস' হয়ে যাওয়া। ক্লাস আর ওয়ার্কশপে নারায়ণ সান্যালের নানান কীর্তি।

ইস্হাক টেস্ট কাকে বলে জানেন? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কেমিস্ট্রির প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষা সঙ্গে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে আর আমেরিকান মিলিটারি জিপের সম্পর্ক নিয়ে কিছু জানা আছে কি? জানতে গেলে পড়তে হবে। তবে এ সময়ের সব অভিজ্ঞতাই মজার নয়। স্টাডি লিভে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সহপাঠীর মৃত্যু, দাঙ্গার বিষাক্ত পরিবেশে অজয়দার নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলিম হস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষের বাজারে মন মন চাল বোটানিকাল গার্জেনে পচতে দেখা — নানা জাতের অভিজ্ঞতা বাদলবাবুর জীবন তখন প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই সময়ই কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের জড়িয়ে পড়েন তিনি। ছাত্র ফেডারেশনের হাওড়া জেলা কমিটির জ্ঞান চক্রবর্তীর সঙ্গে হাওড়ার নানা শহরে ও গ্রামে সভা করা, নির্বাচনের অল্প - স্বল্প কাজ (নাকি অকাজ?) করা, চট্টগ্রামে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিয়ে কলেজ থেকে প্রায় বিতাড়িত হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে প্রথম চাকরি করতে বাদলবাবু গেছিলেন নাগপুর। পুরোদস্তুর সেই খোট্টাই চাকরি মাস চারেকের বেশি পোষায় নি তাঁর। কলকাতায় ফিরে বেসরকারি কলেজে পড়ানোর চাকরির সঙ্গে পার্টির কাজ করতেন পুরোদমে। মানিকতলা অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করতেন তেলকল শ্রমিক - নেতা গোপাল সিংহের সঙ্গে। একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে সফল ধর্মঘটের বর্ণনা এই বইতে আছে। তারপর ১৯৪৮-এর উগ্র বামপন্থার রাজনীতি। কলকাতা জেলার সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটিতে তিনি। ব্যর্থ হলো রেল ধর্মঘটের চেষ্টা। পার্টির সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল বাদলবাবুর। শেষমেশ সাসপেনশন। তবু লেগে ছিলেন পার্টির সঙ্গে আরও কিছুদিন। যখন চালু ধারণা ছিল : পার্টি ছাড়লে হয় গাঁজা নয় আত্মহত্যা— তখনই পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক এক সময় চুকিয়ে দিলেন তিনি।

এর মাঝে বিয়ে করেছেন, সন্তানও হয়েছে। বাবা-মা সে-বিয়ে মানেন নি। ফলে বার বার বাসা বদলে বেশ কষ্ট করেই জীবনযাপন। চাকরি নিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সন্ধেবেলা শিবপুরে পড়তে গেলেন টাউন প্ল্যানিং। নাটকের সঙ্গে সঙ্গে টাউন প্ল্যানিং হলো বাদলবাবুর আর - এক প্রেম। এন্টালিতে থাকার সময় এনাকার সঙ্গে জুটে আবার অভিনয়ের শুরু। তারপর ডিভিসি -র চাকরি করতে মাইথন। সেখানে বাদলবাবুর উদ্যোগে প্রথমে রিহার্সাল ক্লাব, পরে নাটকের দল চালু হয়। ফের কলকাতায় ফিরে কর্পোরেশনের চাকরি। তারপর পড়তে আর চাকরি করতে কয়েক বছর বিদেশ বাস। এ পর্যায়ে তিনি প্রথমে যান ইংল্যান্ডে পরে ফ্রান্স ও নাইজেরিয়ায়।

বাদলবাবুর প্রবাস-বৃত্তান্তগুলো গড়পড়তার থেকে আলাদা। বিলেত - ফ্রান্স নিয়ে পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে তা লেখা হয় নি। চাকরি আর শিক্ষার খোঁজে ইউরোপে কয়ের বছর কাটানো এক তরুণের নানান অভিজ্ঞতা পরপর সাজানো রয়েছে তাতে। ইংল্যান্ডেই প্রথম থিয়েটর ইন দ্য রাউন্ড-এর সঙ্গে পরিচয়। তাছাড়া সেখান তখন প্রচুর নাটক আর সিনেমা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। জন গিল্গাড, ভিভিয়ান লে, চার্লস লটন প্রমুখর অভিনয় তখন সেখানে দেখেছেন।

১৯৫৬ সালে কলকাতায় থাকতেই সলিউসন-এক্স দিয়ে নতুন করে নাটক লেখার শুরু তাঁর। বিলেতে থাকতেই লিখে ফেললেন বড়োপিসিমা। সত্যিই জন্মস্থানের দিক থেকে বাদলবাবুর নাটকগুলি রীতিমতো আন্তর্জাতিক। তেষট্টিতে কলকাতায় থাকার সময় লেখা হয় এবং ইন্দ্রজিৎ কিন্তু তার বীজ পোঁতা হয়েছিল লন্ডনে থাকার সময় একটি ডাইরিতে। সারারাত্তির, বল্লভপুরের রূপকথা ইত্যাদি চারটে নাটক ফ্রান্সে থাকার সময় লেখা। নাইজেরিয়ার লেখা হয়েছিল ছটি নাটক।

নাইজেরিয়ার এনুগুতে যাওয়া ও সেখানে বাস করার অধ্যায়টি অসাধারণ। যে বিষয় তেমনি ভাষা। এর একটি অংশ ১৯৬৪ -তে নানামুখ -এ বেরিয়েছিল 'ডেস্টিনেশন এগুলু' নামে। ঘনাদার একটি উপন্যাসের রসদ মজুত আছে এই প্রবাস -

বৃত্তান্তে বাদুলবাবু সেখানে ছিলেন সেখানে ছিলেন সপরিবারে। টাউন প্ল্যানারের চাকরি। তাই জানতে হয় অনেক কিছু। নাইজেরিয়ার তখনকার ভূগোল, জনবিন্যাস, রাজনীতি—এসব ব্যাপারে নানা তথ্যে লেখাটি সমৃদ্ধ।

তারপর আবার কলকাতা। সি এম পি ও-র চাকরি আর নাটক। নিজের লেখা নাটক। এক এক নাটকে দলের একটা নাম। পরে চক্র এবং ১৯৬৮ -তে শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম। নিয়মিত অভিনয় চলতে লাগল নানা মঞ্চে। মাঝে কিছুদিন বহুরূপী-র সঙ্গে কাজ। বাদলবাবুর নির্দেশনায় তাঁরই নাটক প্রলাপ-এর অভিনয় করেছিল বহুরূপী। বাদলবাবুই কি বহুরূপী -তে একমাত্র নির্দেশক যিনি বহুরূপী-র সদস্য ছিলেন না?

সাহিত্য অকাদেমি পুরুষ্কার পাওয়ার পরে আবার বিদেশ যাওয়ার সুযোগ। কালচারার এক্সচেঞ্জ-এ পূর্ব ইউরোপের তিনি দেশে ভ্রমণ। এবং ইন্দ্রজিৎ -এর সুবাদে তখন তিনি বিখ্যাত। সোভিয়েত রাশিয়ার তাগাঙ্কা থিয়েটরে লিউবিমোভ - এর কাজ দেখলেন। সেখানে গোর্কির মাদার -এর এক অন্য ঘরানার প্রযোজনা দেখেছিলেন। সেই নাটকের কিছু কিছু দৃশ্যর বর্ণনা এ বইতে আছে। পোল্যান্ডে হ্রোৎস্লাভ শহরে দেখা করলেন পুত্তর থিয়েটরের গ্রোতোভ্স্কির সঙ্গে। মত বিনিময় হলো।

প্রসেনিয়ামের বাইরে এসে নাটক করার ভাবনাটা বাদলবাবুর মাথায় বহুদিন ধরেই ছিল। বিলেত ও ফ্রান্সে এমন বেশ কিছু থিয়েটর তিনি দেখেছিলেন। পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ, Theatre in the Round নামের বই পড়া, আমেরিকায় ওরকম অন্য প্রয়োজনার কথা জানা— এরকম বেশ কটা ঘরানার পর ''১৯৭২ -এর ১৮ জুন এ.বি.টি.এ হলে সাগিনা মাহাতো নাটকের পরীক্ষামূলক অভিনয় হোলো এই পদ্ধতিতে''। তারপর জহরলাল ফেলোশিপ নিয়ে আকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তিন তলায় পাকাপাকিভাবে শতাব্দী-র নতুন ধারার থিয়েটরের অভিনয় শুরু। ততদিনে চাকরি ছেড়ে পুরোদস্তুর নাটকেই ভিড়ে গেছেন বাদলবাবু।

এরপর কলকাতাতেই আলাপ রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে। তাঁদের কাজ দেখতে আমেরিকা-কানাডায় উড়ে গেলেন বাদলবাবু। আরও সমৃদ্ধ হলো তাঁর বিকল্প থিয়েটরের ভাবনা।

পুরোনো কাসুন্দি-র চতুর্থ খণ্ডে আর কালপরম্পরা বজায় রেখে জীবনের কথা লেখা হয় নি। বিভিন্ন বিষয়ে ছোটো ছোটো কয়েকটা অধ্যায় নিয়ে এই খণ্ডটি লেখা।

'খোলা মাঠ' শিরোনামে প্রবন্ধটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। কার্জন পার্কে নাটক, সেখানে নাটক চলাকালীন পুলিশের লাঠিতে প্রবীর দত্তর মৃত্যু, তার পরবর্তী আন্দোলন এবং তাতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, খোলা মাঠে শতাব্দী-র নাটক আরম্ভ করার কথা নিয়ে লেখাটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

চলচ্চিত্রে অল্প - সল্প কাজ করার অভিজ্ঞতা বাদলবাবুর আছে। সে সম্বন্ধে লেখা 'ছায়াছবির ছোঁয়া'। এখানে আছে অমল পালেকর, অমরীশ পুরী, অপর্ণা সেন প্রমুখের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কর নানা কথা। 'বারীনের গপ্পো' -ও বেশ উপভোগ্য। বারীন সাহা ছাড়াও পুরোনো কাসুন্দি-তে বারবার এসেছে প্রিয় বন্ধু কানু (অজিতনারায়ণ বসু) ও তাঁর স্ত্রী, বাদলবাবুর বান্ধবী মনু (অঞ্জুলি বসু)-র কথা।

আত্মজীবনী লিখতে বসে বাদলবাবুর যেটা মনে হয়েছে, অকপটে সেটাই বলেছেন। কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত— বাংলা নাট্যমঞ্চের দুই মহারথী সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য অনেকের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। অবশ্য ঐ দুজনই কারণে অকারণে বাদল সরকারকে খোঁচা মারতে কসুর করেন নি। সারারাত্তির প্রযোজনার সময় শম্ভুবাবু ও বাদলবাবুর অ্যানালজি সংক্রান্ত কথোপকথনটি বেশ মজাদার। চাঁদ বণিকের পালা-র প্রথম খণ্ডটি শ্রীবটুক ছদ্মনামে কার খেলা? —এই পুরনো সন্দেহকে আবার উস্‌কে দিয়েছেন বাদলবাবু। নিজের সহ - অভিনেতাদের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন বইতে। কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত হত্যার প্রতিবাদে করা নাটকে সাহস করে অভিনয় করলে কঠোর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নাটক বন্ধ করে দেবার কথা কখনও ভাবেন নি।

বাদলবাবু নিজের নাটকের ব্যাপারে বেশ গুছোনো লোক। কবে, কোথায়, কোন্ নাটকের অভিনয় হয়েছিল তা একেবারে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। কোন্ চরিত্রে কে অভিনয় করেছেন সে-কথাও রয়েছে। এসব তথ্য নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

পুরোনো কাসুন্দি শুধুই বাদল সরকারের জীবনী নয়, প্রচুর খবরের বই। যাঁরা বিকল্প পথে হাঁটতে চান তাঁদের বল - ভরসা জোগানোর বই। বইটির পঞ্চম খণ্ডর অপেক্ষায় রইলাম।